بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু’মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৭ জুন, ২০২৫ মোতাবেক ২৭ এহসান, ১৪০৪ হিজরী শামসী’র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবায়, সৈনাবাহিনী নিয়ে মহানবী (সা.)-এর সংগোপনে মক্কার নিকটে পৌঁছানোর এবং সেনা শিবির স্থাপনের উল্লেখ করা হয়েছিল। তিনি (সা.) দশ হাজার স্থানে আগুন প্রজ্জ্বলিত করান। আবু সুফিয়ান এবং তার সাথিরা এ দৃশ্য দেখে ভীষণভাবে ঘাবড়ে যায়। এর কিছু বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক স্থানে এভাবে এর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন:

হযরত আব্বাস (রা.) যেহেতু আবু সুফিয়ানের পুরানো বন্ধু ছিল, তাই তিনি আবু সুফিয়ানকে তার সাথে বাহনে চড়ে মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হবার ওপর জোর দেন। সুতরাং তিনি তার (আবু সুফিয়ানের) হাত ধরে তাকে উটের পিঠে নিজের পেছনে বসান এবং গোড়ালির খোঁচা দিয়ে উট হাঁকান এবং মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে পৌঁছেন। হযরত আব্বাস (রা.)-র আশঙ্কা ছিল, হযরত উমর (রা.) তাকে (অর্থাৎ আবু সুফিয়ানকে) আবার হত্যা না করে ফেলেন, যিনি তার সাথেই নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন, তোমাদের মধ্যে কারো যদি আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাৎ হয় তাহলে তাকে হত্যা কোরো না। এসব দৃশ্য আবু সুফিয়ানের হৃদয়ে এক বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আবু সুফিয়ানের স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে, মাত্র কয়েক বছর পূর্বে আমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে কেবল একজন সঙ্গীসহ মক্কা থেকে বের হতে বাধ্য করেছিলাম। কিন্তু মাত্র সাত বছর যেতে না যেতেই তিনি (সা.) দশ হাজার পবিত্রচেতা সঙ্গীসহ কোনো নির্যাতন ও অত্যাচার না করেই বৈধভাবে মক্কায় প্রবেশ করেন, অথচ এটি প্রতিহত করার ক্ষমতা মক্কাবাসীদের নেই। অতএব, মহানবী (সা.)-এর বৈঠকে যাবার পথে কিছুটা এসব ভাবনার কারণে এবং কিছুটা ভয়ভীতির কারণে আবু সুফিয়ানের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেতে বসেছিল। মহানবী (সা.) তার এই অবস্থা লক্ষ করে হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলেন, আবু সুফিয়ানকে নিজের সাথে নিয়ে যাও এবং রাতে তোমার কাছে রাখো। তাকে সকালে আমার কাছে নিয়ে এসো। অতএব, আবু সুফিয়ান হযরত আব্বাস (রা.)-র সাথে রাত যাপন করে। সকালে তাকে যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসা হয় তখন ফজরের নামাযের সময় ছিল। মক্কার লোকেরা প্রত্যুষে উঠে নামায পড়ার বিষয়ে কী-ই বা জানতো! আবু সুফিয়ান মুসলমানদেরকে পানি ভর্তি ঘটি নিয়ে এদিক-সেদিক যাওয়া-আসা করতে দেখে। সে দেখে, কেউ ওযু করছে, কেউ সারিবদ্ধ হচ্ছে। এটি দেখে আবু সুফিয়ান মনে করে, আমার জন্য হয়ত নতুন কোনো ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে বিচলিত হয়ে হযরত আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করে, এত সকালে লোকেরা এসব কী করছে? হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, তোমার ভয় পাবার কিছু নেই, এরা নামায পড়তে যাচ্ছে। এরপর আবু সুফিয়ান লক্ষ করে, হাজার হাজার মুসলমান মহানবী (সা.)-এর পেছনে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তিনি (সা.) যখন রুকূ করেন তখন সবাই রুকূ করে, আর যখন তিনি (সা.) সিজদা করেন তখন সবাই সিজদা করে। হযরত আব্বাস (রা.) পাহারায় থাকার কারণে নামাযে অংশ নেন নি। আবু সুফিয়ান

তাকে জিজ্ঞেস করে, এরা এখন কী করছে? আমি লক্ষ করছি, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যা করছেন এরাও তা-ই করছে। আব্বাস (রা.) বলেন, তুমি কোন চিন্তাভাবনায় মগ্ন? এখানে তো নামায পড়া হচ্ছে। কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি এদেরকে পানাহার করতেও বারণ করেন, তাহলে এরা সবাই পানাহার ত্যাগ করবে। আবু সুফিয়ান বলে, আমি কিসরার (পারস্যের সম্রাটের) দরবারও দেখেছি এবং কায়সারের (রোমান সম্রাটের) দরবারও দেখেছি, কিন্তু তাদের জাতিকে তাদের জন্য এতটা নিবেদিত দেখি নি, যতটা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসারী দল তাঁর জন্য নিবেদিত। এরপর আব্বাস (রা.) বলেন, এটি কি সম্ভব নয় যে, আজ তুমি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে এই অনুরোধ করবে যেন তিনি তাঁর জাতির প্রতি ক্ষমাসুলভ ব্যবহার করেন? নামায শেষ হলে হযরত আব্বাস (রা.) আবু সুফিয়ানকে নিয়ে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন। তিনি (সা.) বলেন, আবু সুফিয়ান! তোমার কাছে এই কি এ সত্য প্রকাশিত হবার সময় এখনও আসে নি যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই? আবু সুফিয়ান বলে, আমার পিতামাতা আপনার প্রতি নিবেদিত হোক। আপনি পরম সহিষ্ণু, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী মানুষ। এ বিষয়টি এখন আমার কাছে স্পষ্ট, যদি আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো উপাস্য থাকত তাহলে কিছুটা হলেও আমাদের সাহায্য করত। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু সুফিয়ান! আমি যে আল্লাহ্‌র রসূল– তা বোঝার সময় কি এখনও তোমার হয় নি? আবু সুফিয়ান বলে, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, এ বিষয়ে এখনও আমার মনে কিছু সংশয় রয়েছে। কিন্তু আবু সুফিয়ানের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও তার দুই সাথি, যারা মক্কা থেকে তার সাথে মুসলমান বাহিনীর সংবাদ নিতে এসেছিল, যাদের মধ্যে একজন ছিলেন হাকীম বিন হিযাম– তিনি মুসলমান হয়ে যান। এরপর আবু সুফিয়ানও ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু তার হৃদয় সম্ভবত মক্কা বিজয়ের পরই পুরোপুরি আশ্বস্ত হয়েছিল। ঈমান আনার পর হাকীম বিন হিযাম বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই সেনাবাহিনী কি আপনি আপনার জাতিকে ধ্বংস করার জন্য নিয়ে এসেছেন? মহানবী (সা.) বলেন, এই লোকেরা যুলুম করেছে, এই লোকেরা পাপ করেছে এবং তোমরা হুদাইবিয়ার সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘন করেছ এবং খুযাআর বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে যুদ্ধ করেছ। সেই পবিত্র স্থানে যুদ্ধ করেছ, যাকে আল্লাহ্ নিরাপদ করেছিলেন। হাকীম বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার কথা সঠিক, আপনার জাতি নিঃসন্দেহে এমনটিই করেছে। কিন্তু আপনার তো উচিত ছিল মক্কায় আক্রমণ করার পরিবর্তে হাওয়াযিন জাতির ওপর আক্রমণ করা। মহানবী (সা.) বলেন, সেই জাতিও সীমালঙ্ঘনকারী; কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রত্যাশা রাখি– তিনি মক্কা বিজয়, ইসলামের বিজয় ও হাওয়াযিনের পরাজয়– এই সবগুলোই আমার মাধ্যমে সম্পাদিত করবেন।

এরপর আবু সুফিয়ান বলে, যদি মক্কার লোকেরা তরবারি ধারণ না করে, তাহলে কি তারা নিরাপত্তা লাভ করবে? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, যে ব্যক্তি তার গৃহের দরজা বন্ধ করে রাখবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আবু সুফিয়ান আত্মাভিমানী মানুষ; (তার একথার) অর্থ হলো, আমার সম্মানেরও কোনো ব্যবস্থা করা হোক। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে; যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের গৃহে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে তার অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে নিজের (গৃহের) দরজা বন্ধ করে বসে থাকবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। যে হাকীম বিন হিযামের গৃহে আশ্রয় নেবে তাকেও নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

এই বিশদ বিবরণ 'দীবাচা তফসীরুল কুরআন'-এ তিনি (মুসলেহ্ মওউদ) লিপিবদ্ধ করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে আবু সুফিয়ান একজন খুবই দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী অদূরদর্শী মানুষ ছিল। মহানবী (সা.) যখন মক্কা বিজয় করেন তখন তাকে বলা হয়, এখনও কি তুমি বুঝতে পারছ না? তুমি কি এখনও অনুধাবন করতে পারো নি, এটা মানুষের হাতের কাজ নয়? উত্তরে সে বলে, এখন বুঝতে পেরেছি যে, তোমার খোদা সত্য; এই প্রতিমাগুলোর মাঝে যদি সত্যিই কিছু থাকত তাহলে এরা এখন আমাদের সাহায্য করত। এরপর যখন তাকে বলা হয়, তুমি কি আমার নবুয়্যতের প্রতি ঈমান আনছ? মহানবী (সা.) তাকে এই প্রশ্ন করেন। তখন সে দ্বিধাদ্বন্দ্ব প্রকাশ করে। আর সে তওহীদ বা একত্ববাদ অনুধাবন করতে পারলেও নবুয়্যতের বিষয়টি বুঝতে পারে নি। তিনি (আ.) বলেন, কিছু মানুষের প্রকৃতিই এমন হয় যে, তাদের মাঝে বিচক্ষণতার ঘাটতি থাকে। যা তওহীদের প্রমাণ ছিল, সেটিই নবুওয়্যতেরও সত্যতার প্রমাণ। কিন্তু আবু সুফিয়ান সেগুলোকে ভিন্ন মনে করতে থাকে। সে তওহীদ ও নবুয়্যতকে পৃথক করে ফেলে। তিনি বলেন, সবাই এক শ্রেণির মানুষ হয় না। কেউ প্রথম সারির, যেমন আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র মতো হয়ে থাকে, কেউ আবার মধ্যম সারির, আবার কেউ শেষের সারির হয়ে থাকে।

ইবনে উকবা বর্ণনা করেন, আবু সুফিয়ান ও হাকীম বিন হিযাম ফিরে যাবার সময় হযরত আব্বাস (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আবু সুফিয়ানের ইসলাম গ্রহণ নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। হযরত আব্বাস বলেন, তাকে ফিরিয়ে আনুন যেন সে ইসলামকে ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয় আর আপনার (সা.) সাথে খোদা তা'লার সৈন্যরাজিকে দেখতে পায়। ইবনে আবি শায়বা বর্ণনা করেন, যখন আবু সুফিয়ান ফিরে যাচ্ছিল তখন হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি আবু সুফিয়ান সম্পর্কে আদেশ দেন তাহলে তাকে পথিমধ্যেই থামানো যেতে পারে। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেন, যখন আবু সুফিয়ান ফিরে যাচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) হযরত আব্বাসকে বলেন, আবু সুফিয়ানকে পাহাড়ের উপত্যকায় থামাও। অতএব, হযরত আব্বাস গিয়ে আবু সুফিয়ানকে থামান। এতে আবু সুফিয়ান বলে, হে বনু হাশেম! তোমরা কি ধোঁকা দিচ্ছ? হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, নবীর অনুসারীরা ধোঁকা দেয় না। আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, তিনি বলেন, আমরা আদৌ প্রতারক নই। তুমি সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করো যেন তুমি আল্লাহ্‌র সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যক্ষ করতে পারো। আর তা দেখতে পারো যা আল্লাহ্ তা'লা মুশরিকদের জন্য প্রস্তুত করেছেন। অতএব, হযরত আব্বাস আবু সুফিয়ানকে সেই উপত্যকায় সকাল পর্যন্ত আটকে রাখেন।

বিভিন্ন গোত্র দলগতভাবে এক এক করে আবু সুফিয়ানের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করছিল। যখন একটি দল অতিক্রম করে তখন সে বলে, হে আব্বাস! এরা কারা? তিনি বলেন, এরা গিফার গোত্রের লোকজন। সে বলল, গিফার গোত্রের (লোকজনের) সাথে আমার কোনো কাজ নেই। অতঃপর জুহায়না গোত্র অতিক্রম করলে সে একই কথা বলে। অতঃপর সা'দ বিন হুযায়েম গোত্র অতিক্রম করলেও সে অনুরূপ কথা বলে, অর্থাৎ এই লোকদের সাথে আমার কীসের কাজ? অতঃপর সুলায়েম গোত্র অতিক্রম করলে সে একই কথা বলে। অতঃপর এমন একটি দল আগমন করে যাদের মতো সে পূর্বে আর কখনো দেখে নি। সে বলল, এরা কারা? হযরত আব্বাস বললেন, এরা হলো আনসার আর তাদের সর্দার হলেন হযরত সা'দ বিন উবাদা, যার কাছে পতাকা রয়েছে। হযরত সা'দ বিন উবাদা

আবেগতাড়িত হয়ে বলেন, হে আবু সুফিয়ান! আজকের দিন লড়াই করার দিন। আজ কা'বার নিষেধাজ্ঞা আর থাকবে না! আবু সুফিয়ান এটি শুনে বলে, হে আব্বাস! ধ্বংসের এই দিন কতই না উত্তম হতো যদি যুদ্ধ করার সুযোগ পাওয়া যেত! অর্থাৎ সে বলে, লড়াই হলে খুব মজা হতো, কিন্তু এখন তো আমরা লড়াইও করতে পারব না। অতঃপর আরেকটি দল আসে যেটি সমস্ত দল থেকে সংখ্যায় কম ছিল, যাতে মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ ছিলেন আর মহানবী (সা.)-এর পতাকা হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-র হাতে ছিল।

অপর এক রেওয়ায়েতে এটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানের পাশ দিয়ে যান তখন সে বলেছিল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি আপনার জাতিকে গণহত্যার নির্দেশ দিয়েছেন? আপনি কি জানেন না, সা'দ বিন উবাদা কী বলেছে? মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, সে কী বলেছে? আবু সুফিয়ান বলে, সে অমুক অমুক কথা বলছিল। আমি আপনাকে আপনার জাতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি সমস্ত লোকজনের চেয়ে সর্বাধিক পবিত্র, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী এবং দয়ালু। মহানবী (সা.) বলেন, সা'দ ভুল বলেছে। আজকের এই দিন তো দয়ার দিন। আজ আল্লাহ্ তা'লা কা'বাকে মহাসম্মান প্রদান করবেন। আর আল্লাহ্ তা'লা কুরাইশকে প্রকৃত সম্মান দান করবেন।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, হযরত সা'দ যা বলেছিলেন তা মুহাজিরদের মধ্য থেকে কেউ একজন শুনতে পেয়েছিলেন। ইবনে হিশাম এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, তিনি ছিলেন হযরত উমর (রা.)। যিনি শুনতে পেয়েছিলেন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা নিরাপদ নই। সম্ভবত হযরত সা'দ (রা.) কুরাইশের ওপর আক্রমণ করে বসবেন। অপর রেওয়ায়েত অনুযায়ী, এ কথাটি হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.) বলেছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-র নিকট বার্তা প্রেরণ করেন এবং তার নিকট থেকে পতাকা নিয়ে তার পুত্র হযরত কায়েসকে প্রদান করেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ইতিহাস গ্রন্থাদির আলোকে এর বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

এই সেনাদল আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার সময় আনসারের সেনাপতি সা'দ বিন উবাদা (রা.) আবু সুফিয়ানকে দেখে বলেন, আজ খোদা তা'লা আমাদের জন্য তরবারির জোরে মক্কায় প্রবেশ বৈধ করেছেন। আজ কুরাইশ জাতিকে লাঞ্ছিত করা হবে। মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ানের পাশ ঘেঁষে যাবার সময় সে উচ্চৈঃস্বরে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি নিজ জাতির লোকদের হত্যা করার অনুমতি প্রদান করেছেন? এইমাত্র আনসারের নেতা সা'দ (রা.) এবং তার সঙ্গীরা এই কথাগুলো বলছিলেন। তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলেছেন, আজ যুদ্ধ হবে এবং মক্কার পবিত্রতা আজ আমাদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আর আমরা কুরাইশকে লাঞ্ছিত করে ছাড়ব। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তো পৃথিবীতে সবার চেয়ে পুণ্যবান, সবচেয়ে দয়ালু এবং সবার চেয়ে বেশি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী ব্যক্তি। আজ কি আপনি নিজ জাতির অত্যাচারের কথা ভুলে যেতে পারেন না? আবু সুফিয়ানের এই অনুযোগ ও আকুতি শুনে সেই সকল মুহাজিরও, যাদেরকে মক্কার অলিগলিতে পেটানো হতো এবং প্রহার করা হতো, যাদেরকে তাদের গৃহ ও সম্পত্তি থেকে উচ্ছেদ করা হতো, (তারা-ও) ছটফট করে ওঠেন আর তাদের হৃদয়েও মক্কাবাসীদের জন্য দয়ার প্রেরণা জাগে এবং তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! (আমাদের ওপর) মক্কাবাসীদের অত্যাচারের যে গল্প আনসার শুনেছে, তার কারণে আজ তারা কুরাইশে সাথে কী আচরণ করবেন– তা আমরা বলতে পারছি না। মহানবী (সা.)

বলেন, আবু সুফিয়ান! সা'দ ভুল বলেছে। আজ তো দয়া প্রদর্শনের দিন। আজ আল্লাহ্ তা'লা কুরাইশ ও কা'বা গৃহকে সম্মানিত করতে যাচ্ছেন। অতঃপর তিনি (সা.) এক ব্যক্তিকে সা'দ (রা.)-র নিকট প্রেরণ করে বলেন, তুমি তোমার পতাকা তোমার পুত্র কায়েসকে প্রদান করো আর তোমার স্থলে সে আনসার সেনাদলের সেনাপতি হবে। এভাবে তিনি (সা.) মক্কাবাসীদের মন জয় করেন আর আনসারের হৃদয়কেও কষ্ট পাওয়া থেকে রক্ষা করেন। আর মহানবী (সা.)-এর কায়েসের প্রতি পূর্ণ আস্থাও ছিল, কেননা কায়েস অত্যন্ত ভদ্র স্বভাবের একজন যুবক ছিলেন। (তিনি) এতটাই ভদ্র ছিলেন যে, ইতিহাসে লেখা রয়েছে, তার মৃত্যুশয্যায় যখন কতক লোক তাকে দেখতে আসে এবং কতক দেখতে আসে নি, তখন তিনি তার বন্ধুদের জিজ্ঞেস করেন, আমার পরিচিত কতিপয় ব্যক্তি কী কারণে আমাকে দেখতে আসে নি? তার বন্ধুরা বলেন, আপনি খুবই সম্পদশীল মানুষ, আপনি প্রত্যেকের কষ্টের সময় তাকে ঋণ প্রদান করেন। শহরের বহু লোক আপনার কাছে ঋণী আর তারা এই জন্য আপনাকে দেখতে আসে নি যে, হয়ত আপনার (অর্থের) প্রয়োজন আর আপনি তাদের কাছে টাকা (ফেরত) চেয়ে বসবেন। তিনি বলেন, ওহ্! আমার বন্ধুরা অকারণে কষ্ট পেয়েছে। আমার পক্ষ থেকে পুরো শহরে ঘোষণা করে দাও, কায়েসের নিকট ঋণী প্রত্যেক ব্যক্তির ঋণ ক্ষমা করে দেওয়া হলো। এরপর এত বেশি মানুষ তাকে দেখতে আসে যে, তার বাড়ির সিঁড়ি ভেঙে যায়।

ইবনে আবি শায়বা বর্ণনা করেন: হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করলে আমি মক্কাবাসীদের কাছে গিয়ে তাদেরকে (ইসলামের প্রতি) আহ্বান জানাব, যেন আপনি তাদের নিরাপত্তা দান করেন। অতঃপর তিনি মহানবী (সা.)-র শাহবা নামক শুভ্র খচ্চরে আরোহণ করে (মক্কার উদ্দেশ্যে) যাত্রা করেন। তিনি মক্কায় প্রবেশ করেন এবং বলেন, হে মক্কাবাসীরা! তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে মুক্তি পাবে। তোমাদের নিকট এত বিরাট সৈন্যবাহিনী এসেছে যাদের মোকাবিলা করার সামর্থ্য তোমাদের নেই। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

সেনাবাহিনী যখন চলে যায় তখন আব্বাস আবু সুফিয়ানকে বলে; অর্থাৎ যেমনটি বর্ণিত হয়েছে, সামনে দিয়ে সেনাবাহিনী অতিক্রম করছিল আর সে দেখছিল; (আব্বাস) আবু সুফিয়ানকে বলেন, এখন নিজের বাহন হাঁকিয়ে দ্রুত মক্কায় যাও এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এসে গেছেন আর তিনি এই এই শর্তে মক্কাবাসীদের নিরাপত্তা প্রদান করেছেন। এতে আবু সুফিয়ান একথা ভেবে মনে মনে আনন্দিত ছিল যে, 'আমি মক্কাবাসীদের পরিত্রাণের পথ বের করেছি।' তার স্ত্রী হিন্দা– যে ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে মানুষজনকে মুসলমানদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষ পোষণের কুমন্ত্রণা দিয়ে আসছিল আর কাফির হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থে সে একজন সাহসী মহিলা ছিল, সামনে এসে নিজের স্বামীর দাড়ি ধরল এবং মক্কাবাসীদের ডাকতে থাকল, আসো এবং এই বৃদ্ধ মূর্খ ব্যক্তিকে হত্যা করো। কোথায় সে তোমাদেরকে এ উপদেশ দেবে যে, যাও এবং নিজেদের প্রাণ রক্ষার্থে ও এ শহরের সম্মান রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে করতে মৃত্যুবরণ করো। আর সে কিনা তোমাদের মাঝে নিরাপত্তার ঘোষণা দিচ্ছে! আবু সুফিয়ান তার এহেন আচরণ দেখে বলল, নির্বোধ কোথাকার! এখন এসব কথা বলার সময় নয়। যাও এবং বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে পড়ো। আমি সেই সৈন্যবাহিনী দেখে এসেছি যাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা সমগ্র আরবে কারো নেই।

ইসলামী সেনাবাহিনীর মক্কায় প্রবেশের ঘটনা এভাবে লেখা আছে:

বুখারীতে হযরত উরওয়া থেকে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়েরকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন মক্কার উচ্চভূমি ‘কাযা’ দিয়ে প্রবেশ করেন, তার পতাকা ‘হাজুন’-এ স্থাপন করেন এবং তাঁর (সা.) না আসা পর্যন্ত সে স্থান পরিত্যাগ না করেন। ‘হাজুন’ হলো মুহাসসাব উপত্যকা অভিমুখে একটি পাহাড়– যা বায়তুল্লাহ্ থেকে দেড় মাইল দূরত্বে অবস্থিত।

হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রা.) সৈন্যবাহিনীর ডানপাশে দায়িত্বরত ছিলেন। তার বহরে আসলাম, সুলায়েম, গিফার, মুযায়না এবং জুহায়না গোত্রসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন যেন তারা মক্কা মুকাররমার নিম্নাঞ্চল ‘লীত’ দিয়ে প্রবেশ করে। তিনি (সা.) তাদেরকে নিকটবর্তী বাড়িগুলোর পাশে পতাকা স্থাপনের নির্দেশ দেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহকে পদাতিক বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করেন। মহানবী (সা.) তাঁর সেনাপতিদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, তারা যেন যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। অর্থাৎ যুদ্ধ করবে না। কেবল তার সাথেই যুদ্ধ করবে, যে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। ইবনে ইসহাক লেখেন, সাফওয়ান, ইকরামা এবং সুহায়েল লোকদেরকে মহানবী (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ করার জন্য আহ্বান জানান। তারা লোকদেরকে ‘খান্দামা’ নামক স্থানে একত্রিত করে– যা ‘মিনা’ যাবার পথে মক্কার একটি বিখ্যাত পাহাড়। কুরাইশ, বনু বকর এবং হুযায়েল-এর লোকজন তাদের কাছে একত্রিত ছিল, তারা সশস্ত্র ছিল। তারা আল্লাহ্‌র কসম খাচ্ছিল, মুহাম্মদ (সা.) কখনোই শক্তিবলে মক্কায় প্রবেশ করতে পারবে না। বনু দীল অর্থাৎ বনু বকরের এক ব্যক্তি জিমাশ বিন কায়েস যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আগমন সম্পর্কে শুনতে পারে তখন সে তার অস্ত্রে শাণ দিতে থাকে। তার স্ত্রী তাকে বলে, এ প্রস্তুতি কী কারণে হচ্ছে? সে বলে, মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীসাথিদের জন্য। সেই মহিলা বলল, খোদার কসম! আজকে মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথিদের সামনে কোনো কিছু দাঁড়াতে সক্ষম হবে না। [সে বিচক্ষণ মহিলা ছিল।] জিমাশ বিন কায়েস প্রচণ্ড অহংকার ও তাচ্ছিল্যের সুরে বলে, আমি আশা রাখি, তাদের মাঝ থেকে কোনো একজনকে তোমার সেবায় হাজির করব; অর্থাৎ মুসলমানকে দাস বানিয়ে আনব। তোমার একজন লোকের প্রয়োজন, যে তোমার সেবা করবে; তোমার জন্য দাস নিয়ে আসব। সেই মহিলা বলল, তোমার ধ্বংস হোক! এমনটি কোরো না। মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে যুদ্ধ কোরো না। খোদার কসম! তোমার সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। হায়, যদি তুমি মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সাথিদেরকে দেখতে পেতে! জিমাশ বলল, তুমি অচিরেই দেখতে পাবে। অতঃপর সে সাফওয়ান, ইকরামা ও সুহায়েলের সাথে খান্দামা চলে যায়। যখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ সেখান দিয়ে সেভাবে প্রবেশ করলেন যেভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদেরকে আদেশ দিয়েছিলেন, তখন তারা একটি দল দেখল যারা তাদেরকে প্রবেশ করতে বাধা দিল এবং তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল এবং তাদের প্রতি তির বর্ষণ করল। তারা বলল, তোমরা বলপূর্বক এখানে প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত খালিদ তার সাথিদের ডাকলেন এবং মুশরিকদের সাথে তাদের যুদ্ধ হয়। বনু বকরের বিশজন এবং হুযায়েলের তিন বা চারজন ব্যক্তি নিহত হয়। ইবনে ইসহাকের মত হচ্ছে, মুশরিকদের বারো বা তেরোজন ব্যক্তি নিহত হয়। তারা চরমভাবে পরাজিত হয়। তারা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। একটি দল পাহাড়ের ওপর চড়ে। জিমাশ বিন কায়েস– যে খুব গর্বের সাথে তার স্ত্রীকে জবাব দিচ্ছিল, সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল এবং ঘরে পৌঁছে স্ত্রীকে বলল, দরজা বন্ধ করে দাও। স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সেসব বড়ো বড়ো কথা কোথায় গেল? তুমি তো এখনি বলছিলে, আমি দাস নিয়ে আসব।

তখন সে ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে জবাব দিল এবং কিছু কবিতা পড়ে শোনালো যার অর্থ ছিল, যদি তুমি নিজে খান্দামার যুদ্ধ দেখতে পেতে, যখন সাফওয়ান ও ইকরামা লেজ গুটিয়ে পালায়! তাদের সবাইকে তরবারি স্বাগত জানাল। তরবারি প্রতিটি বাহু ও মাথার ওপর আঘাত হেনে সেগুলোকে কর্তন করছিল এবং চিৎকার-চেঁচামেচি ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। আমাদের পেছনে তাদের গর্জন এবং বক্ষ থেকে উৎসারিত ফুটন্ত ক্ষোভ ও ক্রোধ শোনা যাচ্ছিল। এজন্য তুমি তিরস্কারসূচক কোনো কথাই বলো না।

বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত খালিদের অশ্বারোহীদের মধ্যে দুই ব্যক্তি মারা যায়। তারা হলেন হযরত জুবায়েশ বিন আশর ও হযরত কুরয বিন জাবের ফেহরী।

মক্কাবাসীদের জন্য নিরাপত্তার ঘোষণা সম্পর্কে লিখিত আছে, মহানবী (সা.) আবু সুফিয়ান এবং হাকীম বিন হিযামকে নিরাপত্তা দেন এবং বলেন, মক্কায় গিয়ে ঘোষণা করে দাও, যে অস্ত্র সমর্পণ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, যে নিজ গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, যে কা'বাগৃহ চত্বরে চলে যাবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, যে আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে সে নিরাপত্তা লাভ করবে, আর যে হাকীম বিন হিযামের গৃহে প্রবেশ করবে সে-ও নিরাপত্তা লাভ করবে। মক্কাবাসীরা যখন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ করছিল তখনও মহানবী (সা.) তাঁর ত্যাগী নিষ্ঠাবান প্রিয় সাথিদেরকে ভুলে যান নি। নিশ্চয় কয়েক বছর পূর্বে মক্কার অলিগলিতে হওয়া অত্যাচার ও নিপীড়নের কথাও তাঁর মনে পড়ে থাকবে; সেই বেলালের কথাও (মনে পড়ে থাকবে) যাকে রশিতে বেঁধে এখানে পাথুরে রাস্তায় টানাহেঁচড়া করা হতো। আজ সেই বেলাল এ বিজয়ী সেনাদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তার মনমস্তিস্কেও নিশ্চয় অত্যাচার-নিপীড়নের সেসব দৃশ্য নুতনভাবে জেগে উঠছিল। তিনি (সা.) এটির প্রতিশোধ নেবারও আবশ্যক মনে করলেন। তিনি (সা.) কত-না চমৎকার প্রতিশোধ নিলেন! হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ব্যাপারে বলেছেন:

এরপর আবি রুওয়াইহা, যাকে তিনি (সা.) হাবশী ক্রীতদাস বেলালের ভাই বানিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে তিনি (সা.) বলেন, আমরা এখন আবি রুওয়াইহাকে আমাদের পতাকা দিচ্ছি। যে ব্যক্তি আবি রুবায়হার পতাকাতলে দাঁড়াবে, আমরা তাকেও কিছু বলব না। আর বেলালকে বললেন, তুমি তার সাথে এ ঘোষণা করতে করতে অগ্রসর হও– যে ব্যক্তি আবি রুওয়াইহার পতাকাতলে আসবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে।

এ আদেশের মধ্যে কত-না অনুপম প্রজ্ঞা ছিল! মক্কার লোকেরা বেলালের পায়ে রশি বেঁধে রাস্তায় টানাহেঁচড়া করত। মক্কার অলিগলি ও মাঠ-ময়দান বেলালের জন্য নিরাপদ স্থান ছিল না। বরং শাস্তি, লাঞ্ছনা এবং ঠাট্টাবিদ্রুপের স্থান ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সা.) লক্ষ করলেন, আজ হয়ত বেলালের হৃদয়ে বার বার প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা জেগে থাকবে। এ বিশ্বস্ত সঙ্গীর হয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করাও অত্যাবশ্যক। পক্ষান্তরে এটিও অত্যাবশ্যক, যেন আমাদের প্রতিশোধ ইসলামের মর্যাদা অনুযায়ী হয়। সুতরাং তিনি (সা.) তরবারির মাধ্যমে তার শত্রুদের গর্দান কেটে দেবার মাধ্যমে বেলালের প্রতিশোধ নেন নি, বরং তার ভাইয়ের হাতে একটি বড়ো পতাকা দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন এবং বেলাল (রা.)-কে এ ঘোষণা প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিয়ে দাঁড় করিয়ে দেন যে, যারাই আমার ভাইয়ের পতাকাতলে দাঁড়াবে তাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করা হবে। এটি কত আকর্ষণীয় প্রতিশোধ ছিল, কত সুন্দর প্রতিশোধ ছিল এটি! বেলাল যখন উচ্চকণ্ঠে এ ঘোষণা দিচ্ছিলেন, হে মক্কাবাসীরা! আমার ভাইয়ের পতাকাতলে দাঁড়াও, তোমাদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে– তখন নিশ্চয়ই তার হৃদয় থেকে প্রতিশোধের স্পৃহা নিজে থেকেই উবে যেতে থাকবে। আর তিনি হয়ত এটি

অনুভব করে থাকবেন , মহানবী (সা.) আমার জন্য যে প্রতিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন– এর চেয়ে অধিক আকর্ষণীয় ও মহান প্রতিশোধ আমার জন্য আর হতে পারে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অন্যত্র এ ঘটনা সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

এই ঘটনায় সর্বাপেক্ষা মহান কথাটি ছিল বেলালের পতাকা সংক্রান্ত। মহানবী (সা.) বেলালের পতাকা প্রস্তুত করে বলেন, যে ব্যক্তি বেলালের অর্থাৎ তার ভাইয়ের পতাকাতলে দাঁড়াবে তাকে নিরাপত্তা দেওয়া হবে। অথচ নেতা তো মহানবী (সা.) ছিলেন, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর জন্য কোনো পতাকা উত্তোলন করা হয় নি। তাঁর (সা.) পর সর্বাপেক্ষা অধিক কুরবানীকারী ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), কিন্তু আবু বকর (রা.)-র জন্যও কোনো পতাকা উত্তোলন করা হয় নি। তার পর ইসলাম গ্রহণকারী নেতা ছিলেন উমর (রা.), কিন্তু উমর (রা.)-র জন্যও কোনো পতাকা দাঁড় করানো হয় নি। তার পরবর্তীতে গ্রহণীয় ব্যক্তি হিসেবে উসমান (রা.) ছিলেন এবং তিনি মহানবী (সা.)-এর জামাতা ছিলেন, কিন্তু উসমান (রা.)-র জন্যও কোনো পতাকা উত্তোলিত হয় নি। তার পরে ছিলেন আলী (রা.) যিনি তাঁর (সা.) ভাই ও জামাতা ছিলেন, কিন্তু আলী (রা.)-র জন্যও কোনো পতাকা উড্ডীন করা হয় নি। অতঃপর আব্দুর রহমান বিন অওফ সে ব্যক্তি ছিলেন যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেন, তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত আছেন– মুসলমান জাতির মাঝে মতবিরোধ দেখা দেবে না; কিন্তু আব্দুর রহমানের জন্যও কোনো পতাকা প্রস্তুত করা হয় নি। অতঃপর তাঁর (সা.) চাচা আব্বাস (রা.) ছিলেন আর কখনো কখনো বাড়াবাড়িও করে ফেলতেন, তবুও তিনি (সা.) রাগান্বিত হতেন না; কিন্তু মহানবী (সা.) তার জন্যও কোনো পতাকা প্রস্তুত করেন নি। অতঃপর সমস্ত সর্দার ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। খালিদ বিন ওয়ালীদ উপস্থিত ছিলেন, যিনি একজন সর্দারের পুত্র ছিলেন আর স্বয়ং নিজেও বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। আমর বিন আস একজন সর্দারের পুত্র ছিলেন। অনুরূপভাবে আরো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন সর্দারদের পুত্ররা ছিলেন, কিন্তু তাদের কারো জন্যই পতাকা প্রস্তুত করা হয় নি। পতাকা কেবল বেলালের জন্য বানানো হয়। কেন? এর কারণ কী ছিল? এর কারণ হলো, কা'বা শরীফে যখন আক্রমণ করা হচ্ছিল তখন আবু বকর (রা.) দেখছিলেন, যাদেরকে মারা হচ্ছে তারা তার আত্মীয়স্বজন আর তিনি নিজেও বলেছিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি কি আপনার ভাইদের মারবেন? তিনি অত্যাচারসমূহ ভুলে গিয়েছিলেন আর জানতেন, এরা আমার ভাই। উমরও এ কথাই বলতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এই কাফিরদেরকে হত্যা করুন। কিন্তু তারপরও যখন মহানবী (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন তখন তিনি মনে মনে হয়ত এটিই বলতেন, ভালো হয়েছে, আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে। উসমান ও আলীও হয়ত বলতেন, আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে। তারা আমাদের প্রতি অত্যাচার করেছে তো কী হয়েছে! স্বয়ং মহানবী (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করার সময় হয়ত এটিই ভাবছিলেন, এদের মাঝে আমার চাচা, ভাই, জামাতা, প্রিয়জন ও আত্মীয়স্বজনও আছেন, আমি এদের ক্ষমা করে ভালোই করেছি। আমার নিজ আত্মীয়স্বজন বেঁচে গেছেন। কেবল একজন ব্যক্তিই ছিলেন যার মক্কায় কোনো আত্মীয়তা ছিল না, মক্কায় যার কোনো ক্ষমতা ছিল না; মক্কায় তার কোনো বন্ধুও ছিল না। আর তার এই অসহায় অবস্থায় তার ওপর যে অত্যাচার করা হতো, তা আবু বকর (রা.)-র ওপরও করা হয় নি, আলী (রা.)-র ওপরও হয় নি, উসমান (রা.)-র ওপরও হয় নি, কিংবা উমর (রা.)-র ওপরও হয় নি, এমনকি মহানবী (সা.)-এর ওপরও (এত অত্যাচার করা) হয় নি। জ্বলন্ত এবং তপ্ত বালুর ওপর বেলাল (রা.)-কে নগ্ন শুইয়ে রাখা হতো। তোমরা দেখবে, মে-জুন মাসে তোমরা খালি পায়ে

হাঁটতে পারবে না। [মে-জুন মাসে এখানে তেমন গরম পড়ে না। কিন্তু গরম দেশগুলোতে মে-জুন মাসে খালি পায়ে হাঁটা যায় না। আরবেও গরমকালে খালি পায়ে হাঁটা সম্ভবপর নয়।] তাকে নগ্ন করে উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে দেওয়া হতো, তারপর কীলকযুক্ত জুতা পরে যুবকরা তার (রা.) বুকের ওপর নাচত আর বলত, বলো– 'খোদা ছাড়াও অন্যান্য উপাস্য রয়েছে, আর বলো– মহানবী (সা.) মিথ্যাবাদী।' তারা যখন মারত তখন হযরত বেলাল (রা.) নিজ হাবশী ভাষায় বলতেন– 'আসহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আসহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।' সেই ব্যক্তি [অর্থাৎ হযরত বেলাল (রা.)] উত্তরে বলতেন, তোমরা আমার ওপর যতই অত্যাচার করো, আমি যে-ক্ষেত্রে দেখেছি যে, খোদা এক– তাহলে দুই কীভাবে বলতে পারি? আর যখন আমি জানি, হযরত মুহাম্মদ (সা.) খোদা তা'লার সত্যিকার রসূল– তাহলে আমি কীভাবে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলতে পারি? তখন তারা তাকে আরো বেশি প্রহার করা শুরু করত। গরমকালের পুরোটা সময় জুড়ে তার (রা.) সাথে এরূপ আচরণই করা হতো। তেমনিভাবে শীতকালে তারা তার (রা.) পায়ে রশি পেঁচিয়ে মক্কার পাথুরে অলিগলিতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যেত। তার গায়ের চামড়া ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। তারা তাকে টেনে নিয়ে যেত আর বলতো, বলো– মুহাম্মদ (সা.) মিথ্যাবাদী; বলো– আল্লাহ্ ছাড়াও আরো উপাস্য রয়েছে। তিনি (রা.) উত্তর দিতেন, 'আসহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আসহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'।

এখন যখন মুসলিম সেনারা দশ হাজার সংখ্যায় মক্কায় প্রবেশ করতে এলো, বেলাল (রা.)-র হৃদয়ে হয়তো এই চিন্তার উদ্রেক হয়ে থাকবে যে, আজ সেই কীলকযুক্ত জুতার বদলা নেওয়া হবে, আজ সেই আঘাতের প্রতিশোধ নেওয়া হবে। মহানবী (সা.) যখন ঘোষণা দিলেন, যে-ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে সে ক্ষমা লাভ করবে, যে কা'বা শরীফে প্রবেশ করবে সে ক্ষমা লাভ করবে, যে নিজের অস্ত্র সমর্পণ করবে তাকে ক্ষমা করা হবে, যে নিজ ঘরের দরজা বন্ধ করে দেবে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সেই সময় বেলাল (রা.)-র হৃদয়ে এই ধারণা জাগ্রত হয়ে থাকতে পারে যে, তিনি (সা.) তো তাঁর সব ভাইকে ক্ষমা করে দিচ্ছেন এবং ভালো কাজই করছেন, কিন্তু আমার প্রতিশোধ তো নেওয়া হলো না! মহানবী (সা.) দেখলেন, আজ শুধু একজনই আছেন যিনি আমার এই ক্ষমার ঘোষণার কারণে কষ্ট পেতে পারেন, আর তিনি হচ্ছেন বেলাল (রা.)। যাদের আমি ক্ষমা করছি তারা তার ভাই নয়। আর তাকে যে-সব কষ্ট দেওয়া হয়েছে তা আর কাউকে দেওয়া হয় নি। মহানবী (সা.) তখন বলেন, আমি এর প্রতিশোধ নেব আর এমনভাবে নেব যেন আমার নবুয়্যতের মর্যাদাও অক্ষুণ্ণ থাকে এবং বেলালের হৃদয়ও প্রীত হয়। মহানবী (সা.) বলেন, বেলালের পতাকা গেড়ে দাও। আর মক্কার সে-সকল নেতারা, যারা তার বুকের ওপর নৃত্য করত, যারা তার পায়ে রশি বেঁধে টেনে নিয়ে যেত, যারা তাকে উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে রাখত– তাদের বলে দাও, যদি নিজেদের এবং নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের জীবন বাঁচাতে চায়, তাহলে যেন এসে বেলালের পতাকার নীচে দাঁড়ায়। আমি মনে করি, যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে আর যখন থেকে মানুষ ক্ষমতা লাভ করেছে এবং যখন থেকে মানুষ একে অপরের রক্তের প্রতিশোধ নেবার শক্তি ও সুযোগ লাভ করেছে, তখন থেকে এমন মহান প্রতিশোধ অন্য কোনো মানুষ নিতে পারে নি।

বেলালের পতাকা কা'বা শরীফের সামনে যখন গেড়ে দেওয়া হলো, তখন আরবের সেই নেতারা, যারা এক সময় তাকে পদদলিত করত আর বলত, 'স্বীকার করবে কি-না– মুহাম্মদ (সা.) মিথ্যাবাদী!' এরাই তখন হয়ত দৌড়ে, ছুটে গিয়ে নিজেদের স্ত্রী-সন্তানদের

হাত ধরে প্রাণ রক্ষার আশায় এনে বেলালের পতাকার পতাকা তলে দাঁড় করাচ্ছিল। তখন বেলালের হৃদয় এবং তার প্রাণ কীভাবে মহানবী (সা.)-এর জন্য নিবেদিত হয়ে থাকবে! তিনি হয়ত ভাবছিলেন, আমি তো জানি না, এই কাফিরদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতাম কি না। এখন এমন প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে যে, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি, যাদের জুতো আমার বুকের ওপর পড়ত, তাদের সবার মাথা এখন আমার জুতোয়। এটি সেই প্রতিশোধ ছিল যা ইউসুফ (আ.)-এর প্রতিশোধের চেয়েও অধিক মহান ছিল। কারণ ইউসুফ (আ.) স্বীয় পিতার সুবাদে নিজ ভাইদের ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। যার খাতিরে (ক্ষমা) করেছেন তিনি তার পিতা ছিলেন, আর যাদের (ক্ষমা) করেছিলেন তারা তার ভাই ছিলেন। আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের চাচাদের এবং ভাইদের এক দাসের জুতার কল্যাণে ক্ষমা করেছেন। এর তুলনায় ইফসুফ (আ.)-এর প্রতিশোধ কী-ইবা মূল্য রাখে!

একজন অসহায় ব্যক্তি যার শৈশব ও যৌবন কুরাইশ সর্দারদের দাসত্বে অতিবাহিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তার এমন মনস্তুষ্টি করেছেন এবং এমন সম্মান প্রদান করেছেন, যেভাবে বলা হয়েছে, এর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। এটি চিরকালের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অতএব এটি হলো আমাদের মনিব ও নেতা (সা.)-এর প্রতিশোধ নেবার রীতি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।

ইবনে হিশাম লিখেছেন, মক্কা বিজয়ের সময় মুহাজিরদের স্লোগান ছিল 'ইয়া বানী আব্দির রহমান', অর্থাৎ হে আব্দুর রহমানের পুত্রগণ! খাযরাজের স্লোগান ছিল 'ইয়া বানী আব্দিল্লাহ্', অর্থাৎ, হে আব্দুল্লাহ্‌র পুত্রগণ! আর অওস গোত্রের স্লোগান ছিল 'ইয়া বানী উবায়দিল্লাহ্', অর্থাৎ, হে উবায়দুল্লাহ্‌র পুত্রগণ!

মহানবী (সা.) যখন আযাখের পাহাড়ি রাস্তায় পৌঁছান, যা কাযা-র অপর নাম, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন এ পথেই মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তিনি (সা.) তরবারির ঝলকানি দেখে বলেন, আমি কি তোমাদেরকে লড়াই করতে নিষেধ করি নি? তাঁকে (সা.) বলা হয়, খালিদকে আক্রমণ করা হয়েছে তাই তিনিও তরবারি পরিচালনা করেছেন। প্রথমে শত্রুরা হামলা করেছিল। মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত সর্বোত্তম। অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'লা কাফিরদেরকে এটি দেখাতে চেয়েছিলেন, আজ তোমরা শক্তির জোরে মুসলমানদেরকে মক্কায় প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। এটি খোদা তা'লার অটল সিদ্ধান্ত যেটি কেউ প্রতিহত করতে পারবে না। এটি ছিল মক্কায় প্রবেশের প্রারম্ভিক বর্ণনা। আগামীতেও বর্ণনা অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি একজন মরহুমার স্মৃতিচারণ করতে চাই। নামাযের পর তার জানাযা পড়াব। তিনি হলেন লাহোর নিবাসী শ্রদ্ধেয় এনামুল্লাহ্ সাহেবের সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া আমীনা শাহনায সাহেবা। সম্প্রতি তিনি ৫৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার বংশে আহমদীয়াত তার পিতা শ্রদ্ধেয় মুহাম্মদ দীন সাহেবের মাধ্যমে এসেছে। তিনি ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে পনেরো বছর বয়সে কাদিয়ান গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-র হাতে বয়আত করেছিলেন। মরহুমা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মূসীয়া ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও এক পুত্র এবং চার কন্যা রেখে গেছেন। তার পুত্র মুবাল্লেগ সিলসিলাহ মুকাররম ওয়াজীহুল্লাহ্ সাহেব সেনেগালে আছেন আর সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছেন। কর্মক্ষেত্রে থাকার কারণে নিজের মায়ের জানাযা ও দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করতে পারেন নি।

তার পুত্র মুরব্বী সিলসিলাহ ওয়াজীহুল্লাহ্ সাহেব লেখেন, খাকসারের মাতা পরম পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। নিয়মিত নামায-রোযা পালনকারিণী ছিলেন, কুরআন মজীদ নিয়মিত পাঠ করতেন। সন্তানদেরও পরিপূর্ণভাবে দেখভাল করতেন। আহমদীয়া খিলাফতের প্রতি ভীষণ অনুরক্ত ছিলেন। কোনো দুশ্চিন্তা বা আনন্দের সংবাদ আসলে আমাকে বলতেন, যুগ-খলীফাকে পত্র লেখো। নিষ্ঠার সাথে অতিথিসেবা করতেন আর নিজের সামর্থ্যের বাইরে গিয়েও তাদের সেবা করতেন। অ-আহমদী প্রতিবেশীদের সাথেও আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। কতিপয় প্রতিবেশী তার বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তিনি সর্বদা তাদের অধিকার প্রদান করতেন।

তার স্বামী ইনামুল্লাহ্ সাহেব বলেন, আমার সাথে অতি উত্তম এক জীবন অতিবাহিত করেছেন। সারা জীবন জামা'তের যত সেবা করার সুযোগ পেয়েছি তাতে মরহুমা সবসময় সর্বাত্মক সঙ্গ দিয়েছেন। জামা'তের কাজে সারা দিন বা সারা রাত বাড়ির বাইরে কাটাতে হলেও তিনি কখনও অভিযোগ করেন নি। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। মৃত্যুর এক মাস আগে প্রায় ২২জন অতিথির জন্য নিজে রান্না করেছিলেন। দরিদ্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে নিজের প্রয়াত আত্মীয়স্বজনের পক্ষ থেকে চাঁদা আদায় করতেন। সন্তানদের উত্তমরূপে শিক্ষাদীক্ষা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘ সময় ধরে নিজ হালকায় সেক্রেটারি মালের দায়িত্ব পালন করেছেন আর মৃত্যুর সময়েও সেই দায়িত্বেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তার বড়ো ভাই বলেন, তার বোন অত্যন্ত ভালোবাসাপূর্ণ এবং প্রত্যেকের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন। তিনি ছোটোবেলা থেকেই পাঁচ বেলার ফরয নামায পড়তেন, তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং নিজ সন্তানদের পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য যে-সব শিশুই তার বাড়িতে যেত, তাদের নামাযের তদারকি করতেন এবং তিলাওয়াত করার কথা বার বার স্মরণ করাতেন। অ-আহমদীদের সাথেও তার ভালো সম্পর্ক ছিল। একজন অ-আহমদী প্রতিবেশিনী বলেন, তার সাথে আমাদের বিশ বছরের সম্পর্ক ছিল এবং তিনি আমাকে বোনের মতো দেখতেন। আমার সন্তানদের তিনি মায়ের মতো আদর করতেন আর আমার সন্তানরাও তাকে 'আম্মি জি' বলেই ডাকত। আমাকে সর্বদা সর্বোত্তম পরামর্শ প্রদান করতেন। [এরকম ভদ্র, সভ্য অ-আহমদীরাও আছে যারা সম্পর্কও বজায় রাখে আর সঠিক মূল্যায়নও করে।]

রাচনা টাউনের লাজনা প্রেসিডেন্ট বলেন, মরহুমার মৃত্যুতে আমরা আমাদের মজলিস থেকে একজন অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশ্বস্ত একজন লাজনা হারিয়েছি। প্রায় বিশ বছর ধরে তিনি সেক্রেটারি মালের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। জামা'তের তাহরীকসমূহে নিজে সাগ্রহে অংশগ্রহণ করতেন। আর্থিক অবস্থা যেমনই থাকুক না কেন, কাউকে রিক্ত হস্তে ফিরিয়ে দিতেন না। তিনি এবং তার সন্তানরাও সবাই এটি লিখেছেন, প্রতি সপ্তাহেই বৃহস্পতিবার তিনি রোযা রাখতেন, এমনকি গ্রীষ্মকালেও। তার বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান রাখা হলে সেটি সানন্দে গ্রহণ করতেন এবং অতিথিদের সাদরে আপ্যায়ন করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন। তার এক ছেলে যিনি মুরব্বী, যার কথা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, তিনি কর্মক্ষেত্রে আছেন দেখে মায়ের জানাযাতেও অংশ নিতে পারেন নি। আল্লাহ্ তাকেও ধৈর্য এবং সাহস দান করুন এবং সন্তানদেরও তার দোয়ার ভাগীদার করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)